Elearning Info
https://www.elearninginfo.in

‘দুর্নাম—’

অসুখ আর কিছুতেই সারে না।

কাসি সর্দি সারে ত খোসে সর্বাঙ্গ ছেয়ে যায়, খোস গিয়ে লিভার ওঠে ঠেলে— তারপর ন্যাবায় ধরে। চার বছরের ছেলেটাকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি চলেছে ত চলেইছে।

প্যাকাটির মতো সরু চারটে হাত-পা নড়বড় করে, ফ্যাকাসে হলুদবরণ মুখে কাতর অসহায় চোখ দুটি শুধু জুল্-জুল্ করে— সে-চোখে বিশ্বের সকল ক্লান্তি, সকল অবসাদ, সমস্ত বিরক্তি যেন মাখানো।

শিশুর চোখ সে নয়— জীবনের সমস্ত বিরস বিস্বাদ পাত্রে চুমুক দিয়ে তিক্তমুখে কোনো বৃদ্ধ যেন সে-চোখকে আশ্রয় করেছে। শুধু ওই অসহায় কাতরতাটুকু শিশুর।

সারাদিন কান্না আর অন্যায় বায়না। ছবিও এক এক সময় আর পারে না। হঠাৎ পিঠে এক থাবড় মেরে সে বলে, “মর্ না, মরলে যে হাড় জুড়োয় আমার।”

শিশু আরো জোরে নিশীথগগন বিদীর্ণ করবার আয়োজন করে। পাশের বিছানায় ললিত একবার পাশ ফিরে শোয়, একটু ছট্‌ফট্ করে, কিন্তু কিছু বলে না। আগে অনেকবার স্ত্রীকে সে এই নিয়ে ধম্‌কেছে। দুজনের এই নিয়ে ঝগড়াও হয়েছে। কিন্তু আজকাল আর কিছু বলতে পারে না। ছবির এই আকস্মিক অসহিষ্ণুতার পেছনে কি বিপুল বেদনা, হতাশা ও ক্লান্তির ভার যে আছে তা সে বোঝে। কিন্তু তবু বুক্‌টা যেন টন্‌টন্ ক’রে ওঠে।

কিন্তু উপায় নেই। ডকের মাল-তোলা ও নাবানোর সামান্য সরকার। জাহাজ ডকে ভিড়লে তবে দু’পয়সা আসে। নইলে নিছক ব’সে থাকা ছাড়া উপায় নেই। মাসে যা আয় হয় তাতে মুদির ঋণ শোধাই চলে না, তা ডাক্তার। কিন্তু তবু সে কোনো ত্রুটি রাখেনি।

শিশু আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে— সে-চিৎকার আর থামতে চায় না। সে-চিৎকারে বেদনা নেই— আছে শুধু যেন সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

ছবি রাগের মাথায় চাপড় মেরে ফেলে সন্তপ্ত হ'য়ে নানা রকম ক'রে ভোলাতে চেষ্টা করে। ভীতভাবে স্বামীর বিছানার দিকে চেয়ে বোঝবার চেষ্টা করে স্বামীর অসময়ে নিদ্রার ব্যাঘাত হ'ল কি না। নিজের দুচোখ সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তিতে ঘুমে জড়িয়ে আসে। কিন্তু শিশু কিছুতেই থামে না। আদর নয়, খেলনা নয়, কিছু সে চায় না। শুধু তার অন্তরের অসীম বিদ্বেষ কান্নার আকারে উথলে উথলে ওঠে। কান্না নয়— সে সৃষ্টির প্রতি অভিশাপ।

ললিত ঘুমের ভান ক'রে প'ড়ে থাকে আর ভাবে হয়তো।

জীবনের অন্ধ নিষ্ঠুরতার কথা ভাবে না, নিজের বিপুল ব্যর্থতার কথা ভাবে না— দার্শনিক তত্ত্ব মীমাংসা করবার চেষ্টা করে না— ভাবে শুধু ডাক্তার বলেছে, ও-ছেলেকে চেঞ্জে নিয়ে না গেলে চলবে না— কিন্তু সে কেমন ক'রে সম্ভব।

শুনতে পায় ছবি কি কাতর ভাবে কতরকম আদর ক'রে শিশুকে ভোলাবার চেষ্টা করছে।

"লখ্‌খি বাবা আমার, কাঁদে না, কাল তোমাকে একটা লাল মটরগাড়ি কিনে দেব, তুমি ব'সে ব'সে চালাবে—"

শিশুর সেই একঘেয়ে অশ্রান্ত চিৎকার—"কেন তুমি আমায় মারলে—"

ছবি আবার আদর ক'রে কোলে নেবার চেষ্টা করে। "শোন না; তুমি মটরগাড়িতে ব'সে ভোঁ ভোঁ ক'রে হর্ন বাজাবে—"

শিশু হাত-পা ছুঁড়ে মাকে ঠেলে দিয়ে সেই একঘেয়ে সুর ধ'রে থাকে— "কেন তুমি আমায় মারলে—?"

হঠাৎ ললিতের মনে হয় সমস্ত ব্যাপারটা যেন অত্যন্ত হাস্যকর— পরিণত মনের এই শিশু সেজে তাকে ভোলাবার চেষ্টা, শিশুর এই মূঢ় স্বার্থপরতা, এর চেয়ে বিসদৃশ যেন আর কিছু হতে পারে না।

পরক্ষণেই সে নিজের এই মনে-হওয়ার জন্যে অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে ওঠে। লণ্ঠনের আলোয় ছবির সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত শুষ্ক মুখ, নিদ্রাবঞ্চিত কাতর দুটি চোখ দেখতে পায়। মনের এই অসঙ্গত আচরণে নিজের ওপরই তার রাগ হয়।

তাদের দিকে পিছন ফিরে লক্ষ্যহীন ভাবে সে সামনের দেয়ালের দিকে চেয়ে আবার ভাবতে সুরু করে,— বিশৃঙ্খল অসম্বদ্ধ ভাবনা।

না, বিয়ে ক'রে সে অন্যায় কিছু করেনি। করেছে কি? না, কখ্খনো না। ভগ্নীপতির বাড়িতে আশ্রিত হয়ে থেকে সামান্য পড়াশুনো শেষ ক'রেই তাকে কাজে ঢুকতে হয়েছে, ভগ্নীপতির আশ্রয়দানের ঋণশোধ করতে। বিয়ে ত সে করবে না-ই ঠিক করেছিল। আর সেজন্যে কারুর কোনো চাড় ছিল ব'লেও বোধ হয় না। বাংলা দেশের পুরুষ সাধারণত যে-বয়সে বিয়ে করে তা পেরিয়ে যাবার পরও তার সঙ্কল্প অটুট ছিল কিন্তু টলেনি এমন কথা বলা যায় না। মনে মনে যেন একটা বিপুল অতৃপ্তি দিনরাত তাকে পীড়া দিয়েছে। বিয়ে,— পরিপূর্ণ জীবন, নারীর সাহচর্য, একটি একান্ত নিজস্ব সংসার রচনার আনন্দ, অস্পষ্টভাবে এই সমস্তর জন্য ক্ষুধা তার অন্তরকে ব্যথিত করেছে। চির-কৌমার্যের গৌরবে মন তার কোনদিন উল্লসিত হয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করেনি, কেবলি অস্পষ্টভাবে মনে হয়েছে এই একক জীবন ব্যর্থ, পঙ্গু। দারিদ্র্যের কথা সে ভাবেনি এমন নয়, কিন্তু মন তার বারবার বিদ্রোহ ক'রে বলেছে মানুষের দেওয়া দারিদ্র্যের জন্যে জীবনকে নিষ্ফল ক'রে রাখবার কোনো অধিকার তার নেই।

চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে শুনতে পায় শিশু সেই এক গোঁ ধ'রে চিৎকার করছে, "কেন তুমি আমায় মারলে!"

কিন্তু কোথায় চেঞ্জে নিয়ে যাওয়া যায়? ললিত সম্ভব-অসম্ভব অনেক জায়গার কথা ভাবে। টাকারও দরকার। ছবির গয়নার আর কিছু নেই, শুধু দুগাছি বালা— হাতে থাকলে ক্ষয়ে যাবার ভয়ে তোলা আছে। তার দাম কতই বা হবে! বড়জোর এক শ' টাকা। তাই নিয়ে কোথায়ই বা চেঞ্জে যাওয়া যায় এবং কদিনই বা থাকা যায়। এসব ব্যাপার সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

কিন্তু শিশুর চিৎকার যে কিছুতেই থামতে চায় না। ললিত হঠাৎ উঠে বসে। ছবি একেবারে অবসন্ন হয়ে প'ড়ে ওই চিৎকারের মাঝেই ব'সে ব'সে একটু ঢুলছিল। ললিতের ওঠার শব্দে সে চম্‌কে সজাগ হয়ে ওঠে; তারপর কান্নার ওপরেই ছেলেটার পিঠে সজোরে চাপড় মেরে বলে, "হ'ল ত! সকলের ঘুম ভাঙালে ত! —কোথা থেকে এমন-রাক্ষস এসেছিল আমার পেটে!"

ললিত এবার ব্যথিত হয়ে বলে, "আঃ, আবার মারো কেন?"

"না মারবে না! রাত-দুপুরে ডাকাত-পড়া চিৎকার ক'রে পাড়া-সুদ্ধ লোকের ঘুম ভাঙালে গা!"

"অসুখে ভুগে ভুগেই না অমন খিট্‌খিটে হয়েছে।" ব'লে ললিত শিশুকে

কোলে নেবার চেষ্টা করে। শিশু কিছুতেই কোলে আসতে চায় না। সজোরে ছবির আঁচল মুঠিতে চেপে ধ'রে আরো জোরে চিৎকার সুরু করে।

ঝট্‌কা দিয়ে আঁচল ছাড়িয়ে নিয়ে ছবি উঠে দাঁড়ায়, বলে, "তা মরুক না! মরলে যে বাঁচি।"

"ছিঃ, কি বলছ ছবি!"

এবার ছবি কেঁদে ফেলে, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, "বলব আবার কি। ও যে বাঁচতে আসেনি সে কি আর আমি বুঝতে পারিনি। এমনি ক'রে ভুগে, ভুগিয়ে, হাড়মাস খাখ্‌ ক'রে ও যাবে।"

ছবি ললিতের দিকে পিছন ফিরে বোধ হয় আঁচলে চোখ মোছে।

শিশু শীর্ণ রক্তহীন হাত বাড়িয়ে ললিতের কোল থেকে 'মার কাছে যাব' ব'লে অশ্রান্তভাবে চিৎকার করে।

"ডাক্তার ত বলেছে চেঞ্জে নিয়ে গেলেই সারবে।" ললিতের মুখ থেকে কথাগুলো ঠিক আশ্বাসের সুরে যেন বেরুতে চায় না। ও-আশায় সে নিজেই যে বিশ্বাস হারিয়েছে।

ছবি উত্তর দেয় না। ছেলেটাকে স্বামীর কোল থেকে নিয়ে বিছানায় জোর ক'রে শুইয়ে ধমক দিয়ে বলে, "চুপ কর্‌ শিগ্‌গির, ফের চিৎকার করলে দরজা খুলে ওই রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসব।" তারপর নিজে তার পাশে শুয়ে প'ড়ে স্বামীকে বলে, "তুমি শোও না গিয়ে। এমন ক'রে সারারাত জাগলে চলবে? সারাদিন আপিসে খাটবে আর সারারাত ছেলের জ্বালায় দুচোখের পাতা এক করতে পারবে না, এমন করলে শরীর টেঁকে!"

ললিত এসে বিছানায় শুয়ে প'ড়ে বলে, "তুমি ত একটুও ঘুমোতে পেলে না।"

"এই ত আমি শুয়েছি। এইবার ঘুমোব।"

কিন্তু ঘুমোন তার হয় না। শিশু এবার নতুন বায়না ধরে। একটা বিশেষ নির্দিষ্ট স্থান দেখিয়ে মাকে বলে, "তুমি শুলে কেন? এইখানে বোসো না!"

নির্দিষ্ট সেই স্থানটিতে ছবিকে বসতেই হবে। ছবি আদর করে, ধমক দেয়, মিনতি ক'রে বলে, "লখ্‌খি বাবা, বড্ড ঘুম পেয়েছে, একটুখানি শুই,— আচ্ছা এইখানটাতে শুচ্ছি— এবার ত হ'ল!" কিন্তু তাতে হয় না। সেইখানটাতে শুলে হবে না, বসতে হবে।

শিশুর সেই এক পণ, "শুলে কেন, এইখানটাতে বোসো না।"

শুয়ে শুয়ে ললিতের অসহ্য বোধ হয়। আবার উঠে ব'সে বলে, "ওকে নিয়ে একটু রাস্তায় বেড়িয়ে আসব?"

ছবি বিরক্ত হয়ে ওঠে, "তুমি আবার উঠলে কেন বলো ত?"

"ওর বায়না যে কিছুতেই থামছে না!"

"তাই জন্যে রাত-দুপুরে রাস্তায় বেড়াতে যেতে হবে! তুমি শোও দেখি।"

ললিত হতাশ হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। নিদ্রালস চোখ দুহাতে রগড়ে' নির্দিষ্ট জায়গায় ব'সে ছবি শিশুর বায়না নিবৃত্ত করে।

ললিত স্ত্রীর সে শ্রান্ত অবসন্ন মূর্তির দিকে চাইতে পারে না। পেছন ফিরে শুয়ে মনে মনে চেঞ্জে যাবার টাকা সংগ্রহের অসংখ্য আজগুবি কল্পনা করে।

তারপর কখন্ বোধ হয় একটু তন্দ্রা আসে। কিন্তু খানিক বাদেই শিশুর চিৎকারে তন্দ্রা ভেঙে যায়। উঠে দেখে, ব'সে থাকতে থাকতেই কখন্ আর না পেরে অত্যন্ত আড়ষ্টভাবে ছবির মাথাটা কাৎ হয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়েছে। এবং শিশু পা দিয়ে ঠেলে, হাত ধ'রে টেনে, নানা প্রকারে তাকে জাগাবার চেষ্টা ক'রে চিৎকার ক'রে কাঁদছে—"তুমি শুলে কেন! এইখানে বোসো না!"

অমনি চ'লে এসেছে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত!

টিনের চালের একটি বড় ঘর, গোলপাতায় ছাওয়া ছোট্ট একটি নিচু রান্নাঘর আর একফালি সরু উঠোন— এই নিয়ে সংসার। কলতলার পাশে একটা নামহীন বুনো গাছ বেড়ে উঠেছে; অসময়ে শীতকালে তাতে অপরিচিত অজস্র ফুল ধরে; তার না আছে গন্ধ, না আছে রূপ। তবু সেইটুকু শোভা।

ও যেন দীন সংসারের মুখে হতাশার হাসি।

এই ছোট সংসারটির ভেতরেই কিন্তু মানুষের সেই পুরাতন কাহিনীর একটি ক্ষীণ ধারা শ্রান্তভাবে বয় দিন থেকে রাতে, রাত হতে আবার নতুন দিনে। —মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অমানুষিক কৃচ্ছ্রসাধনার অসামান্য আত্মবলি-দানের কাহিনীর ধারা।

হয়তো বিধাতারও চমক লাগে।

ললিত কিন্তু নিজেকে অন্যরকম বোঝায়। তার কাছে অপরিস্ফুটভাবে

এ-সব শুধু আনন্দের ঋণ-শোধ, মনুষ্যত্বের গৌরবের মূল্যদান। তার বেশি কিছু নয়। জীবন শুধু মন্থর স্রোতে হালকা নৌকোর মতো অত্যন্ত সহজে ভেসে যাবে ভেবে ত সে বিয়ে করেনি। জীবনের অগ্নিপরীক্ষা, বিবাহের দায়িত্ব— অনেক কথাই সে যে আগে ভেবেছে।

তবু ঋণ যেন আর শোধ হতে চায় না। ছবির দিকে সে ভালো ক'রে আজকাল চাইতে পারে না। গলার কণ্ঠি দেখা যায়, চোয়ালের হাড় ঠেলে উঠেছে। পরিশ্রমে দুর্ভাবনায় উনিশ বছরের মেয়ের মুখে যেন উনপঞ্চাশ বছরের ক্লান্তি! খোকা ত দিনের পর দিন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে।

ডাক্তার সেদিন হঠাৎ একবার নিজে থেকে এসেছিল। গাড়ি থামিয়ে দরজার কাছে পা ফাঁক ক'রে দাঁড়িয়ে ওয়েস্টকোটের দু'পকেটে দু'হাতের বুড়ো আঙুল গুঁজে একটু সাম্‌নে ঝুঁকে, পরম আত্মীয়ের মতো স্নিগ্ধ অনুযোগের কণ্ঠে ব'লে গেল, "আপনারা এখনো চেঞ্জে নিয়ে যাননি! নাঃ, আপনারা ছেলেটাকে বাঁচতে দিলেন না দেখছি!"

ডাক্তার যেতে ললিত বললে, "কিন্তু ডাক্তার আমাদের একটু ভালোবাসে, দেখেছ ছবি? ঠিক ব্যবসাদারি আমাদের সঙ্গে করে না। না?"

ডাক্তারের সহৃদয়তার আলোচনায় খানিকটা সময় বেশ কাটল। ললিত মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে, দু'এক দিনের মধ্যে যা-হোক-ক'রে টাকার জোগাড় সে করবেই। ছবি অন্য দিনের চেয়ে যেন একটু স্ফূর্তিভরে "কলের জল বুঝি যাবার সময় হ'ল" ব'লে কাজে গেল। সমস্ত সংসারের ওপর যে বেদনার গুরুভার চেপে ছিল, সেটা যেন অনেকটা হালকা হয়ে গেল সামান্য একটি মানুষের ক্ষণিকের অভিনয়ে।

কিন্তু সে কতক্ষণ আর!

আবার রাত্রি আসে। ললিত শ্রান্ত হতাশ হ'য়ে ঘরে ফেরে। শিশু নিয়মিত বায়না ধরে। মার আঁচল চেপে শুয়ে থাকে, মাকে সে ছেড়ে দেবে না।

"রান্না-বান্না কিছু করতে হবে না আমার? এমনি ব'সে থাকলে চলবে?" — ছবি জোর ক'রে চ'লে যাবার চেষ্টা করে।

শিশুর কান্নায় কাতর হয়ে ললিত বলে, "থাক্ না, আমি না-হয় যা হোক বাজার থেকে কিছু কিনে আনছি। তুমি বোসো ওর কাছে।"

"হ্যাঁ, এই জল-কাদায় আপিস থেকে দু'কোশ পথ হেঁটে এলে, আবার

এখনি যাবে বাজারে! ছেলের অত আদরে কাজ নেই! আর বাজারের খাবার তোমার সয় কোনদিন?"

"একদিন খেলে কিছু হবে না। আর তুমিও একদিন জিরোও না!" ললিত যেন অনুনয় করে।

"না না, আমি রাঁধতে যাচ্ছি। এই বৃষ্টিতে বাজারে যেতে হবে না।" ছবি জোর ক'রে উঠে পড়ে। শিশু কেঁদে হাত-পা ছুঁড়ে একাকার ক'রে তোলে।

ললিত আর কথা না কয়ে বেরিয়ে যায়। বাইরে টিপ্ টিপ্ ক'রে বৃষ্টি পড়ে, পথ কাদায় কাদা। পায়ে পায়ে জুতো সে কাদায় ব'সে যায়. ললিতের শ্রান্ত পা যেন কাদা থেকে উঠতে চায় না।

ওই রুগ্ন পাচ বছরের শিশুকে কেন্দ্র ক'রে এই ছোট সংসারটি ক্লান্তপদে পরম দুঃখের ভার বহন ক'রে নিঃশব্দে আবর্তন করে।

শিশুর অন্ধ অবোধ স্বার্থপরতার কাছে অহরহ বলিদান চলে।

ললিত ভাবে,—শিশু, ভবিষ্যৎ মানব সে, সে যে সব কিছু দাবি করতে পারে, কোনো ত্যাগই তার জন্যে যে যথেষ্ট নয়।

ডাক্তার আর একদিন এসে বক্তৃতা দিয়ে গেছে— এবার আর সহৃদয়তার সুরে নয়, মুরুব্বিয়ানার চালে, চেয়ারে আলগোছে ব'সে কোলের ওপর টুপি খুলে ডান হাতে ছড়ি দোলাতে দোলাতে, কোমরে বাঁ-হাত দিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে অনেক কথা ব'লে গেছে,—শিশুকে সংসারে আনবার দায়িত্বের কথা, ভবিষ্যতের প্রতি কর্তব্যের কথা, ইত্যাদি।

যাবার সময় মোটরে উঠেও মুখ বার ক'রে বলেছে—"দেখুন, এমন ক'রে একটা মানুষকে পৃথিবীতে নিজের সুখের জন্যে এনে যারা তার প্রতি কর্তব্য করে না, তাদের জেল হওয়া উচিত— ঠিক বলুন, জেল হওয়া উচিত নয়?"

ললিত তেমনি আপিসে যায়-আসে, কিন্তু তার মুখ যেন কঠিন হয়ে গেছে পাথরের মুখের মতো। তার মনের গোপনে কি সঙ্কল্প জন্ম নিয়েছে কে জানে!

খোকা সেরে উঠছে। স্পষ্ট সেরে উঠছে। খোলা বারান্দায় ডেক-চেয়ারে ব'সে ব'সে ললিত খোকার খেলা দেখে। ছবি চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে বলে, "কিন্তু কি সুন্দর জায়গা বাপু, আমার যেন আর কলকাতায়

ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না।" তারপর মুখ নামিয়ে ললিতের কানের কাছে চুপি চুপি আনন্দোজ্জ্বল মুখে বলে, "দেখ, কাল খোকাকে কোলে নিতে গিয়ে আমার হাত দুটো টন্ টন্ ক'রে উঠল।"

রাঙামাটির দেশের রঙ যেন ছবিরও গালে লেগেছে; শালবনের সজীবতা যেন তার সারা দেহে ঝল্‌মল্ করে।

ললিত তার দিকে একবার মুখ ফিরিয়ে চায়, তারপর নীরবে কি যেন ভাবে।

ছবি খানিক বাদে হেঁকে বলে, "ছি খোকা, ছেড়ে দাও, ওর লাগবে।"

খোকা তখন খেলার সাথিটির ঘাড়ের ওপর চেপে তার মাথাটি মাটিতে ঠোকবাব চেষ্টা করছে।

অগত্যা ললিত উঠে গিয়ে ছাড়িয়ে দেয়।

উৎপীড়িত ছেলেটি কিন্তু ধুলোমাখা মাথায় উঠে একটুও না কেঁদে ঈষৎ ম্লান হেসে মধুর কণ্ঠে বলে, "দেখুন ত কাকাবাবু, আমি কি ওকে ঘাড়ে করতে পারি!"

নিজের অজ্ঞাতে প্রতিবেশীর এই সুশ্রী সুন্দর মধুরকণ্ঠ ছেলেটির সঙ্গে নিজের ছেলের তুলনা ক'রে হঠাৎ ললিত মনে মনে অকারণে অত্যন্ত পীড়া অনুভব করে।

ছেলেটি রোগা, মাথায় রেশমের মতো কোমল একমাথা দীঘ চুল— নীলাভ চোখ দুটিতে, ছোট্ট মুখে ম্লান হাসিটি যেন লেগেই আছে।

ললিত খোকার কান ধ'রে ধম্‌কে জিজ্ঞাসা করে, "কেন ওর মাথা মাটিতে ঠুকে দিচ্ছিলে? ঝগড়া না ক'রে থাকতে পাবো না?"

খোকা মুখচোখ রাঙা ক'রে নীরব হয়ে থাকে। অপর ছেলেটি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলে, "না, ঝগড়া হয়নি ত! ও ঘোড়া-ঘোড়া খেলতে বললে কিনা, তাই আমি ওকে তুলতে পারিনি ব'লে আমার মাথাটি একবার মাটিতে ঠুকে দিয়েছিল। আমার ত লাগেনি!"

"না, ওর গায়ে কখ্‌খনো হাত তুলো না।" ব'লে খোকাকে ধম্‌কে ললিত আবার ফিরে এসে বারান্দায় বসে।

ছবি একবার বলে, "খোকার সঙ্গে ওদের টুনু কিন্তু পারে না।" তারপর ললিতের গম্ভীর মুখ দেখে চুপ ক'রে যায়।

খোকা ও টুনুর খেলা কিন্তু জমে না। টুনুর সমস্ত সাধ্যসাধনা, মিনতি-অনুরোধ অগ্রাহ্য ক'রে খোকা ক্রুদ্ধমুখে গুম হয়ে ব'সে থাকে। তারপর হঠাৎ অকারণে প্রাণপণ শক্তিতে টুনুকে চিম্‌টি কেটে দৌড়ে পালিয়ে যায়।

টুনু ককিয়ে কেঁদে ওঠে।

ছবি গিয়ে তাড়াতাড়ি তাকে কোলে তুলে নিয়ে খোকাকে বকতে সুরু করে।

শুধু ললিত চেয়ার থেকে ওঠে না, সমস্ত মুখ তার অকস্মাৎ বেদনায় কালো হয়ে যায়। টুনু শান্ত হয়ে খানিক বাদে যখন এসে বলে, "কাকাবাবু, খোকা আমায় মেরেছে, আর আমি খেলতে আসব না।" তখন পর্যন্ত ললিত কথা কয় না, সামনের দিকে চেয়ে নীরবে কি ভাবে সে-ই জানে!

টুনু কিন্তু বিকালবেলা আবার এল।

খোকাকে নিয়ে তখন ললিত একটু লেখাপড়ার চেষ্টা করছে, এবং আধঘণ্টা পরিশ্রমেও স্লেটের ওপর খোকাকে দিয়ে অ-কারের যৎসামান্য সাদৃশ্যেরও কোনো অক্ষর লেখাতে না পেরে হতাশ হয়ে উঠেছে।

টুনু এসে একপাশটিতে চুপ ক'রে বসল। ললিত বললে, "তুমি অ লিখতে পারো টুনু?"

একগাল হেসে টুনু বললে, "পারি কাকাবাবু, আমি বোধোদয় থেকে টানাও লিখতে পারি! লিখব কাকাবাবু?"

অবাক হয়ে ললিত বললে, "তুমি বোধোদয় পড়ো!"

"বোধোদয় আমার শেষ হয়ে গেছে। অ লিখে দেখাব কাকাবাবু?" ব'লে আগ্রহভরে টুনু স্লেটের দিকে হাত বাড়াল।

খোকা কিন্তু স্লেট দিলে না। দৃঢ়মুষ্টিতে স্লেট আঁকড়ে ধ'রে রইল।

"ওকে স্লেট্‌টা দিতে বলুন না কাকাবাবু"— টুনু অনুনয় ক'রে বললে, "আমি খুব ভালো ক'রে অ লিখে দেখাব।"

হঠাৎ কঠিন স্বরে ললিত বললে, "থাক, তোমার লিখতে হবে না. ও এখন পড়ছে, এখন তুমি বাড়ি যাও।"

টুনু অপ্রত্যাশিত কঠিন স্বরে ভীত হয়ে মুখটি কাঁচুমাচু ক'রে আস্তে আস্তে চ'লে গেল।

ললিত কিন্তু আর এক মুহূর্তও ব'সে থাকতে পারলে না; টুনু যেতে না যেতে সে গম্ভীর মুখে উঠে বেরিয়ে গেল।

দেখা হতে ছবি জিজ্ঞাসা করলে, "আজ এরি মধ্যে পড়াশোনা হয়ে গেল? বাবা! ওকে নিয়ে তুমি যে রকম উঠে-প'ড়ে লেগেছ, জজ-মেজিষ্টের না ক'রে আর ছাড়বে না!"

গম্ভীর মুখে ললিত শুধু বললে, "হুঁ।"

দুদিন টুনু আর আসে না। ললিতের লজ্জা গ্লানি ও অনুশোচনার আর অন্ত নেই। খোকাকে নিয়ে একবার তাদের বাড়ি যাবার জন্যে বেরিয়েও সে মাঝপথ থেকে ফিরে এল। নিজের মাথা তার নিজের কাছে চিরকালের জন্যে হেঁট হয়ে গেছে।

পরদিন হঠাৎ সকালে বাইরের গেটের কাছে বেরিয়েই সে চম্‌কে ডাক্‌লে, "টুনু!"

গেটের পাশে দাঁড়িয়ে টুনু উৎসুক দৃষ্টিতে ভেতরের দিকে চাইছিল। ললিতকে দেখতে পেয়ে সে ভীত কুণ্ঠিতভাবে চ'লে যাবার উপক্রম করলে।

"তুমি আর খোকার সঙ্গে খেলতে আসো না কেন টুনু?"

সাদর সম্ভাষণে ভরসা পেয়ে টুনু অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে বললে, "আপনি তাহ'লে বকবেন না ত কাকাবাবু?"

অকারণেই ললিতের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল; এই ক্ষীণকায়, ফুলের মতো কমনীয় ছেলেটির সমস্ত কথাবার্তা আচরণে এমন একটি করুণ মাধুর্য আছে!

তাড়াতাড়ি তাকে বুকে তুলে নিয়ে ললাটে চুমু খেয়ে ললিত বললে, "না বাবা, কেন আমি তোমায় বকব!"

টুনুর মুখ তৎক্ষণাৎ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল— বললে, "আমি খেলতে যাই তাহ'লে?"

তাকে নামিয়ে দিয়ে ললিত বললে, "যাও।"

টুনু উল্লসিত হয়ে ছুটে গেল।

দুদিন বাদে আজ প্রথম প্রসন্ন মনে ললিত বেড়াতে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু ফিরে এসে সে-প্রসন্নতা তার রইল না।

দরজার কাছ থেকেই খোকার উচ্চ ক্রুদ্ধ কণ্ঠ শুনতে পাওয়া গেল।

"না, ওকে দুটো দিতে পারবে না মা! কেন, ও নিজের বাড়িতে গিয়ে খেতে পারে না? হ্যাংলা কোথাকার!"

লজ্জায়, বেদনায়, রাগে ললিতের কান পর্যন্ত রাঙা হয়ে উঠল। হিংসার এ জঘন্য রূপ ওইটুকু শিশুর মাঝে প্রকাশ পেল কোথা থেকে, ভাবতে ভাবতে সে নিঃশব্দে আপনার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

সেখান থেকে শুনতে পেল ছবি বোঝাবার চেষ্টা করছে—"না বাবা, ওরকম হিংসুটে-পনা কি করতে আছে, ও তোমার ভাই হয়; ও দুটো খাক্, তুমিও দুটো খাও।"

টুনুর মিষ্ট গলা শোনা গেল—"আমি ত দুটো সন্দেশ খাব না কাকিমা; আমার অসুখ করেছে কিনা, আমি একটুখানি খাব শুধু।"

"আচ্ছা বাবা, তুমি একটা নাও,— আর খোকন্, এই তোমার দুটো, কেমন হ'ল ত?"

কিন্তু এও খোকার মনঃপূত নয়।

"না, ওকে একটাও দিতে পারবে না, ওকে দাও না দেখি, আমি ওর হাত থেকে কেড়ে নেব।"

ছবি এবার রেগে বললে, "কেড়ে নে না দেখি! তুই ত দুটো পেয়েছিস। ও একটা খেলে তোর অত হিংসে কেন?"

"কেন ও আমাদের বাড়ি খাবে! বাবা ত তাড়িয়ে দিয়েছিল, ও আবার এসেছে কেন?"

"বেশ করবে আসবে, বেশ করবে খাবে।"

ব্যাপারটা হয়তো সামান্য। কিন্তু ঘরে ব'সে ব'সে শুনতে শুনতে ললিতের অসহ্য বোধ হচ্ছিল। তার জীবনের সমস্ত আশা, সমস্ত স্বপ্ন, সমস্ত সান্ত্বনা কে যেন মাড়িয়ে থেঁৎলে চ'লে গেছে।

সে নীরবে উঠে গিয়ে পাশের ঘরের দরজায় দাঁড়াল।

ছবি তখন টুনুর হাতে একটি সন্দেশ দিয়েছে। টুনু বলছিল, "আমি ত সবটা খাব না কাকিমা— আমার বড্ড অসুখ করেছে কিনা! আমার ত খেতে নেই।"

কিন্তু তার কথা শেষ হতে না হতেই খোকা সজোরে হাত মুচড়ে সন্দেশটা কেড়ে নিয়ে বললে, "ঈস্, সন্দেশ ওকে খেতে দিচ্ছি কিনা!"

হাতের ব্যথায় টুনু কাতর হয়ে কেঁদে উঠল।

ছবি রেগে খোকার পিঠে চড় কসিয়ে দিলে।

ললিত যেমন নীরবে এসেছিল তেমনি নীরবে নিজের ঘরে ফিরে গেল।

. . . . . .

ছবি এসে বললে, "আহা, ওদের টুনুর বড্ড অসুখ গো!"

ললিত সন্ধ্যার অন্ধকারে বারান্দায় ব'সে ছিল, ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, "কার, টুনুর?"

"হ্যাঁগো, ওর মা তাই কাঁদছিল, ছেলেটা এমন ভালো জায়গায় এসেও সারল না। দিন দিন যেন কেমন শুকিয়ে গেল।"

ললিত আবার মুখ ফিরিয়ে নীরবে দূরে অন্ধকার গিরিশ্রেণীর দিকেই বোধ হয় চেয়ে রইল।

ছবি ঘরে যাবার উদ্যোগ করতেই কিন্তু ললিত হঠাৎ আঁচল ধ'রে টেনে বললে, "শোন!"

"কি?" ব'লে ছবি কাছে এসে দাঁড়াল।

আবার খানিকক্ষণ চুপ-চাপ।

"কি বলবে তাড়াতাড়ি বলো বাপু, আমার কাজ আছে!"

চেয়ারটা ছবির দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে ব'সে ললিত বললে, "খোকা ত বেশ সেরে গেছে, না ছবি?"

"তাই ত মনে হচ্ছে।"

"তাহ'লে তুমি খুব খুশি হয়েছ ত?"

"কি যে কথা বলো তার মাথা মুণ্ডু নেই, একি আবার জিজ্ঞেস করে নাকি মানুষ! আমি খুশি হয়েছি আর তুমি খুশি হওনি?"

ললিত শুধু বললে, "হুঁ।"

ছবি আবার চ'লে যাচ্ছিল। ফের তার আঁচল ধ'রে টেনে রেখে ললিত বললে, "এই খোকা হয়তো বড় হবে, মানুষ হবে, সংসার করবে— কি বলো ছবি?"

গলার স্বরটা ছবির কাছে যেন অস্বাভাবিক মনে হ'ল, বললে, "কি তুমি যা-তা বলছ বলো ত?"

"শোন না, এই খোকা ভবিষ্যতের আশা; পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ও পৃথিবীকে

ভোগ করবে, ধন্য করবে, তাই জন্যে আমাদের এই এত আয়োজন, এত ত্যাগ, বুঝেছ ?"

"যাও, ন্যাকামি আমার ভালো লাগে না !" ব'লে জোর ক'রে আঁচল ছাড়িয়ে ছবি চ'লে গেল।

ললিত অন্ধকারে ব'সে বোধ হয় সেই ভবিষ্যতের একটু আভাস কল্পনায় দেখবার চেষ্টা করতে লাগল।

ক'দিন বাদে হঠাৎ অর্ধরাতে কান্নার স্বরে ঘুম ভেঙে উঠে ছবি ললিতকে জাগিয়ে বললে, "শুনতে পাচ্ছো ?"

ললিত বললে, "হুঁ।"

ছবি ভীত পাংশুমুখে বললে, "কান্নাটা টুনুদের বাড়ি থেকেই আসছে না ?"

"তাই ত মনে হচ্ছে।"

"কাল বড্ড বাড়াবাড়ি গেছে, বোধ হয় মারা গেল।" ব'লে ছবি চোখ মুছলে।

ললিত বিছানা থেকে নেমে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ঘরের মধ্যে পায়চারি ক'রে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়িয়ে বিকৃত স্বরে বললে, "টুনু ম'রে গেল আর আমাদের ছেলে বেঁচে উঠল— আশ্চর্য নয় ছবি ?"

ছবি একবার শিউরে উঠল মাত্র, উত্তর দিল না। ললিত মাথা নিচু ক'রে পায়চারি ক'রে বেড়াতে বেড়াতে ব'লে যেতে লাগল, "আমরা অনেক ত্যাগ করেছি, অনেক সয়েছি, আমাদের ছেলে বাঁচবেই যে ছবি! আমাদের ছেলের মতো আরো কোটি কোটি ছেলে বাঁচবে, বড় হবে, রেষারেষি, মারামারি, কাটা-কাটি ক'রে পৃথিবীকে সরগরম ক'রে রাখবে, নইলে আমাদের এত চেষ্টা, এত কষ্টস্বীকার যে বৃথা ছবি !"—স্বর তার অত্যন্ত অস্বাভাবিক।

ছবি বিরক্ত হয়ে বললে, "তোমার মাথা খারাপ হয়েছে !"

"বোধ হয় !" ব'লে হঠাৎ ছবির হাতটা সজোরে ধ'রে ললিত উগ্রকণ্ঠে বললে, "চেঞ্জে আসবার টাকা কি ক'রে জোগাড় করেছি জানো ছবি ? সন্তানকে পৃথিবীতে আনবার দায়িত্বে কি করেছি জানো ?"

ছবি সে-মুখের চেহারায় অত্যন্ত ভয় পেয়ে বললে, "কি ?"

"চুরি করেছি, জুয়াচুরি করেছি, লুকিয়ে জাহাজের গাঁট্‌রি বিক্রি করেছি। ভবিষ্যতের মানুষের দাবি মেটাতে অন্যায় করিনি নিশ্চয়।"

"তাহ'লে কি হবে!"—ছবির স্বর ভয়ে কাঁপছিল।

ললিত তিক্তমুখে হেসে বললে, "কিছু হবে না, ভয় নেই। সেইটুকুই মজা। এ-চুরি কখনো ধরা পড়বে না। চিরকাল ধ'রে শুধু আমাকে খোঁচা দেবে।"

ললিতের আকস্মিক উত্তেজনা কিন্তু যেমন বেগে এসেছিল, তেমনি বেগে শান্ত হয়ে এল।

দরজা খুলে বাইরে বারান্দায় সে বেরিয়ে গেল।

এবং শীতল স্নিগ্ধ অন্ধকারে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকার পর তার মনে হ'ল এতখানি ক্ষুব্ধ বিচলিত হবার বুঝি কিছুই কারণ নেই।

বিশাল আকাশ নক্ষত্রের আলোয় যেন রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠেছে। তারই তলায় তার মনে হ'ল, এই মৌন সর্বংসহা ধরিত্রী যে যুগ-যুগান্তর ধ'রে বারবার আশাহত, ব্যর্থ হয়েও আজও প্রতীক্ষার ধৈর্য হারায় নি!